'ছেঁড়া তার'-এর বিষয়বস্তুর প্রাথমিক অধ্যয়নে আমরা বুঝে নিতে পারি যে—এটির প্রেক্ষাপট মূলত মৌলবাদী জেহাদী মুসলমান ধর্মের বীভৎসা এবং তার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের মন্বন্তর কবলিত হিন্দু-মুসলমানের জীবনবেদ। তাছাড়া, একটি তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে তুলসীদাস লাহিড়ী গণনাট্য-নবনাট্য ধারারই একজন অতি বাস্তববাদী সামাজিক নাট্যকার। সেকারণে 'ছেঁড়া তার' ও গণনাট্য-নবনাট্যধারারই প্রভাব সঞ্জাত এক সামাজিক নাট্যদলিল। গণনাট্য ধারার নাটকগুলির একটি অত্যাবশ্যক দিক হল অত্যাচারী শাসক-শোষক-সম্প্রদায় কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, তাদের জেহাদী মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত এবং শোষিত জনগণের সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সংগ্রামের মানসিকতাকে জাগ্রত করে দেখানো। কার্যত, সেকারণেই এই জাতীয় নাটকে শোষক-শোষিত এই দুই যুযুধান গোষ্ঠীর সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

'ছেঁড়া তার' নাটকের তিনটি অঙ্কের মোট নয়টি দৃশ্যের সীমায়িত নাট্যঘটনায় কিছুটা হলেও দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের-চিত্র প্রকাশিত। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে কিছুটা যেমন ধর্মের নীতি এবং সামাজিক অনুশাসন রয়েছে তেমনি বেশীরভাগই দখল করে রয়েছে। মন্বন্তর কবলিত প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুরবস্থা। অবশ্য মন্বন্তরের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ তেমন প্রকট নয়; কারণ বিরূপ প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কাছে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অসহায় শিশুর মতোই অতি অক্ষম। কিন্তু মন্বন্তরের অনাহারী দিনগুলিতে সুবিধাভোগী, মাতব্বরের মতো মানুষকে তারা বেশ পরখ করে নিতে পেরেছে। সেকারণে নাটকে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে হাকিমুদ্দীকে। সে'ই শোষক সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন প্রতিভূ। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কাহিনী থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে বাইরের দেখায় এ নাটক মাতব্বর হাকিমুদ্দী এবং শিক্ষিত বুদ্ধিমান ভালমানুষ রহিমুদ্দীর বিরোধ এবং রহিমুদ্দীর সামূহিক বিপর্যয়। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তুর গভীরে অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনার বয়ন থেকে এও প্রমাণিত হয় যে এ নাটক কেবলমাত্র হাকিমুদ্দী-রহিমুদ্দীর হাল্কা সেন্টিমেন্টের সংঘাত-সংঘর্ষ কিংবা রহিমুদ্দীর বিপর্যয়ের কাহিনীর নাট্যরূপ নয়; বৃহত্তর অর্থে হাকিমুদ্দীর মতো প্রজাশোষক এবং তার মাতব্বরীর বিরুদ্ধে, তার লালসার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মানসিকতা এবং অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংঘটিত হবার নাটক এটি। এই দিকের বিচারে সংগ্রামী মানুষদের জননায়ক হিসেবে রহিমুদ্দীই নাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নাটকে প্রথমে ব্যক্তিগত সংঘাত-প্রসঙ্গটি বিচার করা যেতে পারে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রহিমুদ্দী অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা করেছে। মাতব্বরের গাভীটি খোয়াড়ে দিয়েছে। ফলে হাকিমুদ্দী তার এই জাতীয় কাজকে মনের দিক থেকে সমর্থন করতে পারেনি এবং প্রত্যক্ষে রহিমুদ্দীকে সে শাসিয়ে গেছে। 'আচ্ছারে দ্যাখা যাইবে—"। নাট্য ঘটনার অগ্রগমনের ফলে কার্যত হয়েছেও তাই। হাকিমুদ্দী মাতব্বর, প্রজারপীড়ক চরিত্র।

Scanned by CamScanner

তাই তাকে নিয়ে রহিমুদ্দী যখন শ্লোক কিংবা গান বাধে তা'তে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। তবে উল্লেখ্য যে রহিমুদ্দী যে ছড়া বেঁধেছে তা কিন্তু হাকিমুদ্দীর প্রতি তার কেবল নিজস্ব কোন ক্রোধ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নয়; সেই ছড়ায় বৃহত্তর অর্থে শোষিত জনগণের দিককেই প্রকারান্তরে ব্যঞ্জিত করেছে। ব্যক্তিগত ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য রহিমুদ্দীর ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছে হাকিমুদ্দী। এ সত্য বারংবার নাটকে প্রকাশিত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেও এর প্রমাণ মেলে। গীদাল গোবিন্দ বলেছে, 'হাকিমুদ্দি কিন্তুক্ তোর পাছে লাগিয়ায় আছে রে।" প্রত্যুত্তরে রহিমুদ্দীর ছোট সংলাপটি প্রণিধানযোগ্য—"থাকে না ক্যানে। মোর এ্যও কইরবে।"—এসব ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির সংঘর্ষের চিত্র।

হাকিমুদ্দীর অত্যাচার-শোষণের ইতিহাস প্রকারান্তরে জনগণকে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছে। রহিমুদ্দীর গানে মাতব্বরের শোষণের চাল্‌চিত্র অতি বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হতে দেখে গীদাল গোবিন্দ যা বলেছিল তা অত্যাচারিতের জমে থাকা দীর্ঘঃনিশ্বাসেরই প্রকাশ। "বড়য় হক্ কথা কছিস্ ভাইরে। আখেরী বিচারের আশা ধরিয়া দুঃখীর দল বাঁচি আছে। মন কয়, আইজ হউক, কাইল হউক বিচার হইবে!" এই আত্মপ্রত্যয়ের পথ ধরেই চিরদিন দুঃখী মানুষের দল পথ চলে, দিন অতিবাহিত করে ভবিষ্যতের নতুন প্রভাতের জন্য। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে গোবিন্দ তার দিব্যদৃষ্টিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এই দৃশ্যেই আমরা মন্বন্তরের সংবাদ পেয়েছি। এখানেই তিস্তাঘাটের চুরির ঘটনায় রহিমুদ্দীকে মিথ্যাচালে জড়িয়ে ফেলার কথা জেনেছি। এছাড়া হাতেগোনা কয়েকটি বড়লোকের কথা প্রসঙ্গে এবং অত্যাচারিতের শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘবদ্ধ করার কথা শোনা যায় রহিমুদ্দীর কণ্ঠে। "সব গরীব যদি একঠে হয় মাইরবার পারবে?" এই সংলাপ কিন্তু ব্যক্তি বনাম শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে, তার প্রতিরোধ শক্তিকেই ব্যঞ্জিত করেছে। কিন্তু হাকিমুদ্দীর চালে মিথ্যা চুরির দায়ে রহিমুদ্দীর ঘাড়ে এসে পড়ায় উদ্‌ভ্রান্ত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে সে। একসময় ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে সে হাকিমুদ্দীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই অংশে প্রত্যক্ষ বিরোধের প্রকাশ হলো বটে; কিন্তু তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকই থেকে গেল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিরোধের আভায় হয়তো তদন্তকারী পুলিশ অফিসার পর্যন্তও অনুভব করে দিতে পেরেছে, "দ্যাওয়ানীর" কোনও আখেজ আছে নাকি তোমার উপর।"

হাকিমুদ্দী মাতব্বর, তায় সে ক্ষমতাবান বিরুদ্ধ পক্ষ। তার যাবতীয় অপকর্মের সাক্‌রেদ প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট ব্যতীত এই জাতীয় চরিত্রের হিসেবে কানাফকিরও কিছুটা সাহায্য করেছে তাকে। সেকারণে নাটকে তার অত্যাচারের মাত্রা খুব ব্যাপকতা লাভ করেনি। অন্যদিকে শোষিত-সংঘবদ্ধ জনগণের মধ্য থেকেও কেউই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সেদিক থেকে নাটক জমাটি সংঘর্ষ লক্ষ্য করার উপায় নেই। ব্যক্তিক্রোধ চরিতার্থ করতে গিয়ে কুদরতের মুখে মন্বন্তরের দিনে রহিমুদ্দীর রোগ-ভোগের পর তার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে হাকিমুদ্দী প্রকারান্তরে আনন্দই পেয়েছে। আর নিজের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে সে বলেছে "মোর সাথে লাগার ফল।"—এই দৃশ্যের পরের ঘটনা, লোক লাগিয়ে অভুক্ত মানুষদের ক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কিংবা মন্বন্তরের দিনে ধান করজের নাম করে পরের

Scanned by CamScanner

বছর বেশী ধান প্রাপ্তির আশা, এবং প্রজা-শোষণের যে কথার পরিচয় আমরা পাই—তা কিন্তু আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না। তা হয়ে পড়েছে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষকজীবনেরই শোষণের প্রতিচ্ছবি। সমবেত হয়েছে জনগণ। মাতব্বরের বাড়িতে দরবার করেছে। সরেমামুদ, শ্রীমন্ত-এরা সবাই ধানের দাবীতে এসেছে। কিন্তু মাতব্বরের সঙ্গে এদের কথোপকথনে ব্যক্তি-দ্বন্দ্বের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর শ্রেণী সংঘাতের ইঙ্গিত আভাসিত হয়েছে। তা দ্বন্দ্বের আভাসমাত্র বলেই মনে হয়েছে। হাকিমুদ্দীর ধানের গোলা লুট করার কথায় শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একসময়ে রহিমুদ্দীকে চুরির দায়ে ফাঁসানোর কাজে সাহায্য করেছিল কুক্‌রা। সেই কুক্‌রার অভুক্ত পিতা সাহায্যের কাতর আবেদন নিয়ে এসেছে মাতব্বরের কাছে। কূটকৌশলী মাতব্বর কুকরার বাবা শিয়ালুকে সেই টাকা না দিতে চেয়ে কার্যত সে গরীবকে শোষণের প্রমাণই রাখে। অব্যর্থভাবে শোষকের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে শিয়ালু। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাবার অব্যবহিত পূর্বে সে বলে গেল চলি যাইতেছি। তোমার মত সয়তান মানুষের সয়তানি থাকিয়া, মাইনষের যত শ্বাস আর যত চৌউখের পানী পড়ে তার হিসাব যদি না হয় ত' দুনিয়া থাকি খোদার নাম উঠি যাইবে—খোদার নাম উঠি যাইবে—।" এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিশোষণ নয়; গোষ্ঠীশোষণের দিকটিরও পরিচয় মেলে। খোদার বিধান হিসেবে অভুক্ত শিয়ালু যেভাবে অত্যাচারিতের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রত্যাশার আলোকে উষ্‌কিয়ে গেল সেই আশাকে রহিমুদ্দী জীবন দিয়ে সেই বিধানকেই কিছুটা ত্বরান্বিত করে যাবে—এর প্রমাণ পাওয়া যাবে নাটকের অন্তিম দৃশ্যে। ব্যক্তিগত বিরোধের সময় রহিমুদ্দীর পাশে ছিল গোবিন্দ-শ্রীমন্তরা। কিন্তু মন্বন্তর যখন প্রকট হ'ল, তখন এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভিন্‌গ্রামের বাসিন্দা—দশলিয়ার সরেমামাদ, শালপাড়ার তমিজ কিংবা সাহানাৎ। কার্যত তারাও দাবী করেছে খাদ্যের। এরাও হাকিমুদ্দীর উপর ক্রুদ্ধ নাটকে প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বের সীমানা বেশ অনেকটাই প্রসারিত হতে পেরেছে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের বিষয়-বিন্যাস মন্বন্তর কেন্দ্রিক। ব্যক্তি রহিমুদ্দীর প্রসঙ্গ এনে দিয়েছে হাকিমুদ্দীর চরিত্রের শোষণের দিকটিকে। আর মন্বন্তর মানুষকে বাধ্য করেছে মানুষ বিক্রিতে, গৃহপালিত পশু বিক্রিতে এগিয়ে যেতে। এসবই কার্যত মন্বন্তরের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। এরূপ পরিস্থিতিতে অভুক্ত মানুষেরাও দেশান্তরী হয়ে গ্রাম ছেড়ে যাবার বাসনা প্রকাশ করে। শিক্ষিত যুবক রহিমুদ্দী শহরে ও ভিক্ষুকের মিছিলের কথা খবরের কাগজ মারফৎ জেনে অন্যান্যদেরকে সেবিষয়ে সচেতন করে। ইত্যবসরে শ্রীমন্ত জানায় এবিষয়ে বুদ্ধিমান রহিমুদ্দীই সঠিক পথের নিশানা দিতে পারবে। কলকাতায় ভুখা মানুষেরা কেন ধনীর গৃহে লুঠতরাজ চালায় না—এ কথাই ভাবায় মামুদ, শ্রীমন্তদেরকে। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তারা একাজ করছে না। এই মুহূর্তে সবাই প্রকারান্তরে রহিমুদ্দীকেই অভুক্ত, অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষের নেতৃত্বদানের কাজে এগিয়ে আসে। সে'ই হয়ে ওঠে এদের প্রতিনিধি। "মুই হুকুম দিলে তোরা লুট করবু কিনা? প্রত্যক্ষে নেতারই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে শোনা যায় এখানে। তারই আদেশ কিংবা হুকুমের প্রত্যাশা করে গোবিন্দ, শ্রীমন্ত, তমিজ সরেমামুদেরা। "মোর মত মানুষ একটাও কি নাই ঐ উপাসী গুলার

Scanned by CamScanner

দলে?'' এমন প্রশ্নই শ্রেণী-চরিত্রের প্রতিনিধি রূপে নাটকে আর একবার প্রতিষ্ঠা দেয় তাকে। নাটকে ব্যক্তি দ্বন্দ্বের সীমা প্রসারিত হয়ে গ্রাম থেকে ভিন্নগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিপদের দিনে সব্বাই রহিমুদ্দীর দিকে চেয়ে বসে আছে। কিন্তু একটা উপায় সে দেবেই। অভুক্ত মানুষ কিছুটা হলেও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—মাতব্বর হাকিমুদ্দীর উপর। কারণ তারা হাকিমুদ্দীর থেকে কোনরকম সাহায্য পায়নি তাদের বিপদের দিনে। মামুদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদের সুর। ''আর ত' চুপ করে থাকা যায় না হে।''—কেনই বা এইসব ভূমিপুত্রেরা আকাল-মন্বন্তরের শিকার হবে, আর কেনইবা—'বন্দরিয়া মানুষগুলা' মন্বন্তরের কবলে পড়েনা—এমন মনোভাব থেকে জেগেছে সমাজ-পরিবর্তন করে দেবার ডাক। তাই কিছুটা শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মামুদ। দৃঢ়তা প্রকাশ পায় তার বক্তব্যেও। মন্বন্তরের কবলে পড়ে হয়তো তাদেরই প্রাণপাত ঘটবে এমন আশঙ্কার কথা শুনে স্পষ্টত প্রতিবাদ করে ওঠে মামুদ। মামুদ, রহিমুদ্দী, শ্রীমন্ত, গোবিন্দ-এরা ভিন্‌গ্রামের মানুষ; তবু এরা শ্রেণী-সচেতন হয়েছে। এরা অত্যাচারিতের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। সেকারণেই এরা সংঘবদ্ধ চেতনায় দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়েছে। স্পষ্টত প্রতিবাদের-প্রতিরোধের কথা বলে মামুদ। ''এমনি যামো নাকি? যদি যাওয়ায় লাগে ত' সারা মুল্লুকে আগুন জ্বালেয়া দিয়া যামো। সব মানুষ তোমারে জন্য বসি আছে।'' সমাজব্যবস্থার মূল কেন্দ্রে যারা শোষণের রাজসিংহাসনে বসে আছে—তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে সরেমামুদও তমিজ সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠে ''হবার নয়! তামাম্ মুল্লুকের মানুষ জোটামো।'' এভাবেই নাটকে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে শোষক-ব্যক্তি বনাম শোষিত-জনগণের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের এবং আধিদৈবিক ঘটনা মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে শোষিতের গণচেতনার কিংবা গণ-অভ্যুত্থানের প্রারম্ভিক আভাস দেওয়া হয়েছে নাটকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার ব্যক্তিদ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। লঙ্গরখানা থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে বসির ও ফুলজান। এখানে ব্যক্তি-বনাম ব্যক্তি-সংঘাতই মুখ্য। অসহায় পিতা, অক্ষম স্বামী যুগপত ভাবনায় রহিমুদ্দী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে একসময় ফুলজানকে তালাক দিয়ে দেয় সে। হাকিমুদ্দীর বাড়িতে স্থান হয় ফুলজানের। হাদীজেরে নামে মুসলিম মৌলবাদকেই প্রশ্রয় দেয় হাকিমুদ্দী। কার্যত রহিমুদ্দীর আচরণে ক্ষুব্ধ সমবেত সকলেই। তারা সবাই চায় রহিমুদ্দী ফুলজানের সংসারকে পূর্বের মতো জোড়া লাগাতে। জনগণ হাকিমুদ্দীর কার্য-কলাপ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। হাদীজ ও নিকার বাধা প্রসঙ্গ নিয়ে হাকিমুদ্দীর—মানুষকে প্রতারণার কৌশল সেখানেও ছিল। নিকার জন্য যেমন কানাফকিরের সাহায্য প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ইমাম। হাকিমুদ্দীর ভয়ে রহিমুদ্দীর গ্রামের জুম্মার ইমামনিকার কাজে এগোতে চায়। সেই ইমামতাই অন্য ইমামকে ঠিক করে দিয়েছে। এইসময় রহিমুদ্দীর অসহায় অসুস্থ শিশুর ক্রন্দন অধীর করে তোলে সম্মিলিত জনগণকে। অসহায় মানুষের পাশে প্রতিশোধের স্পৃহা বুকে নিয়ে আগুয়ান হয় জনতা। হাদীজের নামে মৌলবাদী শাসক হাকিমুদ্দীর বিরুদ্ধে জনগণ এককাট্টা হয়েছে। তাদের অন্তরে হাকিমুদ্দীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত ছিল মন্বন্তরের দিনগুলি

Scanned by CamScanner

থেকেই। হাকিমুদ্দীর অত্যাচারে মন্বন্তরের দিনে সবাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ ধানের গোলা লুটের প্রসঙ্গ। স্মরণীয়-দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় দৃশ্য কানা ফকিরের দরকষাকষি এবং ফুলজান সম্পর্কে অশ্লীল ইঙ্গিতে ধৈর্য চ্যুতি ঘটে যায় রহিমুদ্দীর। সে চলে যায় ফুলজানকে নিয়ে আসতে। বাধ সাধতে চায় হাকিমুদ্দী। জনগণ পিছু নেয়। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তাদের কণ্ঠে। "আটকাবার চাইলে ডাঙ্গাও শালাক্"—সকলের কণ্ঠেই শোনা যায়। অত্যাচারী শাসকের শাস্তির আয়োজনে কণ্ঠকিত হয়ে ওঠে নাটকের শেষ দৃশ্য। এ সবই গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলনের প্রভাব সঞ্জাত। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান জনগণ। কেবল ধর্মের জেহাদী• রূপের জন্য নয়; সামাজিক শোষণের দিকটি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। "খবরদার! দ্যাওয়ানী গিরি চইলবার নয়। জুলুম করি করি আস্পর্দ্ধা বাড়ি গেইছে" এই তথ্য একজন কোন বিশেষ চরিত্র প্রকাশ করেনি। হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠস্বর এটি। এসবই সংঘবদ্ধ চেতনার বাহ্যিক প্রকাশ। তারা হাকিমুদ্দীর ঔদ্ধত্য স্বীকার করতে পারেনি। নাট্যকার একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, "উপস্থিত জনতার রুদ্রমূর্তি দেখে হাকিমুদ্দি ভয়ে পিছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই..."। সংবদ্ধ জনশক্তির রুদ্রমূর্তিকে সকল প্রশাসকই ভয় পায় এক সময়। এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমবেত ভাবে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে। সমবেত কণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় হাকিমুদ্দীর বিরুদ্ধে : "আটকি দ্যাখো ফুলজানক্। কাল্লা ছাঁটি দ্যাওয়া হইবে।" এর কিছু পরে কানাফকিরের মন্তব্য—"আইজ উয়ার মৌত হইবে।" নাটকের অন্তিম দৃশ্য এরই অনুগামী। এর পূর্বে আমরা হাকিমুদ্দীর উপর আক্রমণের তথ্য পেয়েছি কানাফকিরের কাছ থেকে।

শোষণের এবং অত্যাচারের শেষ ধাপে উপনীত হয়েছে বৃহত্তর অর্থে গ্রাম্য-জনগণ এবং অন্যদিকে রহিমুদ্দীর পরিবার। শোষণের দিক থেকে এরা একীভূত। তাই গোবিন্দ বলেছে "আর শুনাশুনি নাই। তোর দ্যাওয়ানী গিরির সয়তানী আইজে শ্যাষ।" কিংবা সরেমামুদ যখন বলে, " ওহোঃ দ্যাওয়ানীর কোনয় দোষ নাই। খালিগুণ। মানুষের সর্বনাশ করি ফায়দা করার কতয় না কায়দা আছে তুমার।" তখন তা কৃষক-চাষী শোষণের মাত্রাকেই ব্যঞ্জিত করে। এর পরের গোবিন্দের সংলাপ হাকিমুদ্দীর স্বার্থান্বেষী চরিত্র এবং মানুষ শোষণের বহুমাত্রিক দিককে প্রকাশ করে। "শও শও কায়দা আছে। টাকার কায়দা, হাকিম ত্যালেয়া দ্যাওয়ানী হবার কায়দা, উপকারের নাম করি মানুষের জান মারার কায়দা, হিসাব দ্যাখেয়া চুরি করার কায়দা, তসবী ঘুরেয়া সরলমানুষ ঠকাবার কায়দা। আইন গাইন হদীজ কোরাণ—" এ কেবল ব্যক্তি রহিমুদ্দীকে শোষণের নিদর্শন নয়, প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের-কৃষক শোষণের দিকটিও এখানে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক শুরুর যেমন শেষ থাকেই—তেমনি তার প্রতিরোধে উন্মুখ। প্রতিবাদে গর্জে ওঠা জনগণের কাছে হাকিমুদ্দীর সেই শোষণের সমাপ্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে নাটকে যবনিকা নেমে এসেছে। সেকারণে সরেমামুদের "আইজ তোর মৌৎ হইবে।" এই সংলাপের পর গোবিন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, "তোরে জিৎ হইবে নাকি—সয়তান?"

সংঘবদ্ধ জনগণের বেপরোয়া মানসপ্রতীতি প্রকাশিত হয়েছে এই সংলাপে। যা প্রকারান্তরে জনগণের প্রতিবাদী মানসিকতাকেই ব্যঞ্জিত করে।

Scanned by CamScanner